লোকমাতা' নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ - এর ললামভূষণ এবং জাপানের কাকুজো ওকাকুরা

অসিত দত্ত

আমরা জানি, অনেকেই ভগিনী নিবেদিতার নামের সঙ্গে 'লোকমাতা'- এই পূর্ব অভিধাটি প্রয়োগ করতে ভালোবাসতেন। শঙ্করী প্রসাদ বসুর ভুবন বিদিত গ্রন্থের নামও 'নিবেদিতা লোকমাতা'। 'নিবেদিতা লোকমাতা' বা লোকমাতা নিবেদিতা - যে ভাবেই আমরা উচ্চারণ করি না কেন, ধ্বনি ও বর্ণের সাযুজ্যে এই শব্দবন্ধের অলংকারটি খুবই শ্রুতি সুখকর, সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ কোথায় কি ভাবে 'লোকমাতা' লিখলেন আমরা দেখব।

'শতরূপে সারদা' গ্রন্থের 'লোকজননী' পর্যায়ে ৩২০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 'বিদ্যায়, বুদ্ধিমত্তায়, আভিজাত্যে, আত্মমর্যাদায় ও স্বাতন্ত্রবোধে তিনটি রত্ন পাশ্চাত্যের তিন রমণী এদেশে পদার্পণ করেন। স্বামিজীর উদ্বেগ ছিল - হিন্দুসমাজ এই মহিলাদের কিভাবে গ্রহণ করবে।'

এই রমণীত্রয়ীর মধ্যে উজ্জ্বলতম তারকা হলেন মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল। স্বামিজীর উদ্বেগকে নিরর্থক প্রমাণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিভাবে করেছিলেন, তার খানিকটা আমরা দেখার চেষ্টা করবো। 'লোকমাতা' অভিধায় কেন রবীন্দ্রনাথের সাক্ষর.সমর্থন ছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই, অনেক দেখাদেখি করে এই প্রবন্ধের লেখালেখি করা।

'লোকমাতা' বলতে আমরা কি বুঝবো ? লোক শিক্ষায় যিনি ব্রতচারিণী তিনিই তো একার্থে লোকমাতা। শুধু তাই নয় 'লোকমাতা'-এর শব্দার্থের আরো অনেক ব্যাপকতা দেখিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রাবলীতে। সেটা আমরা পরে দেখবো।

প্রথম পরিচয় একজন সার্থক শিক্ষিকারূপে নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের কাছে সম্যকরূপে পরিচিতা ছিলেন।কবিবর নিজেই কতো কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন নিবেদিতার কাছ থেকে। কবিবর চেয়েছিলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতাকে নিবেদিতা ইংরেজি ও পাশ্চাত্য বিদায় প্রশিক্ষণ দেন। সেই মর্মে তিনি নিবেদিতাকে অনুরোধও করেন। নিবেদিতা কিন্তু সেই প্রস্তাব সটান যাকে বলে পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেছিলেন - 'সে কি! ঠাকুর বংশের মেয়েকে একটি বিলিতি খুকি বানাবার কাজটা আমাকেই করতে হবে?'।

তখনো যদিও নিবেদিতা 'লোকমাতা' উপাধি পাননি। তবে পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রত্যাখ্যান করে প্রাচ্য-বিদ্যায় দীক্ষা তিনি ততোদিনে স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। ক্ষুব্ধ হয়ে নিবেদিতা নির্দ্বিধ স্পষ্ট. বচনে কবিগুরুকে আরো কিছু সংলাপ উপহার দিয়েছিলেন। - 'ঠাকুর বাড়ির ছেলে হয়ে আপনি পাশ্চাত্য সভ্যতায় এমনই আবিষ্ট হয়েছেন যে, নিজের মেয়েকে ফোটবার আগেই নষ্ট করে ফেলতে চান?''

এই না হলে মার্গারেট কি করে নিবেদিতা, তথা 'লোকমাতা' হয়ে উঠেছিলেন? অতএব

বোঝা-ই যাচ্ছে, লোক শিক্ষা চাইলেও নিবেদিতা এমন অশিক্ষার আবেদনে সবেদন গররাজি হলেন।

গরমিল হলো দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গিতে। তবে নিবেদিতা কিন্তু এইভাবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি প্রদীপে আলোক প্রক্ষেপণ করলেন। মনে পড়ে গেল প্রাসঙ্গিক একটি রবীন্দ্রগান ওই আলো যে যায়রে দেখা, ওই আলো – হৃদয়ের পূবগগণে সোনার রেখা। এবারে ঘুচলো কি ভয়, এবারে হবে কি জয়? আকাশে হলো কি ক্ষয় কালির লেখা?

পরবর্তীকালে জোড়া সাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য নিবেদিতাকে রবীন্দ্রনাথ অনুরোধ করেন, এবং বিলক্ষণ সেটা প্রাচ্য বিদ্যারই সপক্ষে আবেদন। নিবেদিতারও তাতে বিলক্ষণ সম্মতি ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নানাবিধ কারণে সেটা ফলপ্রসূ হতে পারেনি। আর একটি আলোক প্রসূণ ঠাকুরবাড়িতে প্রস্ফুটিত হতে পারলো না। এই প্রসঙ্গের সমর্থনে নিতাই বসুর লেখা থেকে জানাই। (পৃ ১১২/১১৩)

"ঠাকুর পরিবারে অনেকের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় থাকলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ ছিল বেশি। তিনিই নিবেদিতার সার্বিক পরিচয় পেয়ে তাঁকে 'লোকমাতা' অভিধায় ভূষিত করেন। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বিবেকানন্দের যোগসূত্রের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন নিবেদিতা। ১৮৯৯ সালের ২৩ জানুয়ারি বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'ব্রাহ্মদের মধ্যে ঢুকে পড়ো' নিবেদিতা এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।" ...

"১৮৯৯ সালে নিবেদিতার চেষ্টায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ একটি চা পানের আসরে একত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে নিবেদিতা বিবেকানন্দের যে ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করেছিলেন, তারই ভিত্তিতে তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লেখেন, "He (Vivekananda) said, "as long as you on mixing with that (Tagore) family Margot I must go on sounding this gong. Remember that family has poured a flood of erotic venom over Bengal." Then he described some of their poetry' এক্ষেত্রে দুঃখের বিষয় এটাই যে, বিবেকানন্দ হয়তো সেভাবে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের রচনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।"

ইংরেজিতে GONG শব্দের অর্থ ধাতব কাঁসর ঘন্টা, ঝাঁঝর কাঁসি, ট্র্যাফিক পুলিশের ক্ষেত্রে ঘন্টা বাজিয়ে গাড়ির চালককে থামার নির্দেশ। বাংলার প্রচলিত অর্থে অনেকটা ট্যাঁড়া বা ক্যানেস্তারা পেটানোর মতোন।

ঘটনাটি ঘটেছিলো ১৯৯৯ সালে। বিশ্বকবি এবং বিশ্বনবী স্বামীজি দুজনেই তখন প্রখ্যাতির তুঙ্গস্থানে সংস্থিত। বিবেকানন্দ প্রয়াত হন ১৯০২ সালে। তখন তার আগে স্বামিজী প্রগাঢ় ভাবে সনাতন হিন্দুধর্মে আস্থাভাজন। এবং সেই ধর্মের প্রবক্তা প্রচারক শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সনাথ বিশ্ববন্দিত এক সন্ন্যাসী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ এর প্রতিষ্ঠাতা। এখানে এটা বলাই বহুলতা যে, ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রহ্মসংগীতের অনুষ্ঠান-এর মোহ কর্পূরটি ততোদিনে উধাও। সেটা

এই প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। সামান্য একটু স্পর্শ বিন্দু থাকবে।

অথচ এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, ভারতীয় আদর্শের প্রতি নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই সমনিষ্ঠ এবং সমকণ্ঠ ছিলেন। কিন্তু এই দুই জীবন-পথিক তাঁদের কর্মসাধনায় ছিলেন ভিন্ন পথের পান্থজন। তবু বোধ-বোধিতে ঋদ্ধ চেতনায় দুজনের মনেই ছিল সারূপ্য ও সাযুজ্যের ফল্গুনদীর প্রবহমানতা? কেউ কারোর প্রতি কখনো বিমুখতা প্রদর্শন করেননি; দুজনের সুজনতা বোধ ছিল এমনই সুচারুতা সুরুচিসম্পন্ন। যেন সমান্তরাল রেখাদ্বয়।

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তি ও তাঁর জীবন দেবতার দার্শনিকতার সঙ্গে নিবেদিতাও ততোটা পরিচিত ছিলেন না। এবং স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম. সুশীল সীমিত জীবন পরিসরে সময় ছিল না রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা করার। তার বিপ্রতীপে ক্রান্তদর্শী জনবৃন্দনাথ রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে নিয়ে প্রচুর প্রবল উচ্চমানসিকতা পোষণ করতেন।

কোনো পূর্ব-পরিকল্পিত প্রকল্প পথে ক্ষমতা ও ইচ্ছা-শক্তির পৃথকতা তো থাকেই। আলোচ্য এই দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যেও ছিলো। লোকমাতা নিবেদিতা যেমন করে জনসংযোগ করতে পারতেন তার একমাত্র লক্ষ্যের জীবনব্রত নিয়ে, অন্য পথের পথিক হয়ে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সেটা সম্ভব ছিলো না। জমিদার রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেটা সম্ভবপর হয়নি, লোকমাতার পক্ষে সেটা অতি অবলীলায় বাস্তবায়িত হয়েছিল। তেমনটি না হলে নিবেদিতা একাধিকবার রবীন্দ্র সকাশে উপস্থিত হতেন না। বেশ কয়েকবার নানা কারণে এই দুইজনের সামীপ্য ঘটেছে।

১৯০৪ সালে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতা শিলাইদহে গিয়ে জমিদার রবীন্দ্রের আতিথ্য.বাৎসল্য গ্রহণ করেন। শুধুমাত্র ভ্রামণিকা হয়ে কিন্তু নিবেদিতা সেখানে যাননি। তিনি যে প্রকৃতপক্ষেই লোকমাতা। পল্লিবাসীজনের অকৃত্রিম সরল ব্যবহার যেমন তাঁকে মুগ্ধ করতো, তেমনি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সাধারণ জনেদের মধ্যে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে নিজেকে তাদেরই একজন বলে মনে করতেন। এমনটাই ছিলো লোকমাতার জনতোষিণী আকর্ষণের যাদুলীলা। শুধুমাত্র চালাকির দ্বারা এমনি এমনি তো আর লোকমাতা হওয়া সম্ভব নয়।

এই ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথ খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন। তাই রবীন্দ্ররচনায় আমরা পাই -

"চাষীরা শশব্যস্তে তাঁকে (নিবেদিতাকে) তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। দিনের পর দিন - মাসের পর মাস - নিবেদিতা যেন আমাকে চিনতে পারেন না। গরমের ছুটিতে ও পুজোর ছুটিতে তিনি বেড়াতে যেতেন। যেখানে যেতেন, সেখানেই তিনি সাধারণ মানুষের মনকে স্পর্শ করার চেষ্টা করতেন। তিনি নিজেকে সেইসব দীন দুঃখী মানুষদের মধ্যে যেন বিলিয়ে দিতেন।" তাই, রবীন্দ্রনাথ 'পরিচয়' গ্রন্থিকায় লিখেছেন ঃ

"ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোক সাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুধুমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গন্ডগ্রামের কুটিরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমান রমনীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে

তাহা সম্ভবপর নহে কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের অতি নিকটে বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।" - 'ভগিনী নিবেদিতা' 'পরিচয়' রবীন্দ্রনাথ ওই 'পরিচয়' রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ লেখেন, তার নাম 'ভগিনী নিবেদিতা'। তিনি ওই প্রবন্ধেই আরও লেখেন -

"আজ এই কথা আমি অসংকোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।...

তাঁহার সর্বোতোমুখি প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রযোগ করিতেন - মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব, সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।" - তদেব (পরিচয়)

তাই ইতিহাসে দেখা যায়, ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় স্বামী বিবেকানন্দ করিয়ে দিয়ে নানান নির্দেশ দিয়ে যাবার পরেও স্বামিজীর মহাপ্রয়াণের পরেও নিবেদিতা সে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি।

সিস্টার থেকে ভগিনী ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইংলন্ডে মিস মার্গারেট নোবল নামের এই আইরিশ গুণবতী স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হন। পরে ভারতে এসে শিক্ষা প্রসারের কাজ করতে করতে 'সিস্টার নিবেদিতা' নামে পরিচিতি পেতে থাকেন। এই ইংলিশ শব্দ 'সিস্টার'-এর অর্থ তথাকথিত 'বোন' বা 'ভগিনী' নয়, যদিও বাংলায় 'সিস্টার'-এর এক শাব্দিক প্রতিশব্দ করা যায়নি। অথবা, তা করলে শুনতে শ্রুতিগ্রাহ্য হতো না। তদর্থে সিস্টারের বাংলার্থ করলে দাঁড়ায়, বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী সদস্যা, মঠবাসিনী, জনসেবিকা। হাসপাতালের নার্সদের যেমন আমরা সিস্টার বলে ডাকি। কিন্তু কখনোই বোন বা ভগিনী বলি না। অথচ সিস্টার মানে বোন। সে দিদিই হোক বা ছোটবোন, সেও কিন্তু দেখা গেছে গর্ভধারিনী মা-এর অবর্তমানে জননী স্বরূপা। সেই অর্থেও 'বোন' এর মাতৃরূপ-এর পরিচয়ের একাধিক উদাহরণ আমরা ব্যক্তিগত জীবনেও প্রত্যক্ষ করে থাকি।

নিবেদিতা দেবী অবশ্য ওইগুলোর কোনো অর্থেই মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনী ছিলেন না। তিনি শ্বেতাম্বরী ছিলেন। বিশেষ ধরণের একটি গাউনকে পরিধেয় করেছিলেন, যে আভরণ দিয়ে তাঁর আপাদকণ্ঠের আবরণ হতো। সেইসব কারণেও নিবেদিতা শব্দের পূর্বনামে সিস্টার শব্দটিতে

রবীন্দ্রনাথের পছন্দাসিকতা ছিল না। এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ 'লোকমাতা' অভিধার ব্যাপারে আমার আর একটা কথা মনে হলো। আমরা আগে দেখেছি যে, কেন স্বামী বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ঠাকুর পরিবার এবং বিশেষত রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের প্রতি কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন ছিলেন। তাতে স্বামীজি এবং রবীন্দ্রনাথের কারোর কিছু এসে যায়নি। দুজনেই সচেতনভাবে একে অপরের প্রতি নিরুচ্চার ছিলেন। কিন্তু আমরা জানি এক আকাশে দুই সূর্যের সম অবস্থান কেউ কাউকে ঝলসে দিতে পারেনি। এবং ভগিনী থেকে লোকমাতায় উজ্জীবিত ও উত্তরিত হতে রবীন্দ্রনাথের তরফ থেকে নিবেদিতার কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি। লোকমাতা নিবেদিতার প্রতি নানা কারণে রবীন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞতার যেন অবধি ছিল না।

একটু আগে নিবেদিতার উজ্জ্বলতার কাছ থেকে কবিগুরুর অনেক প্রাপ্তির প্রসঙ্গে অনেক আলোকপ্রাপ্তির কথা লিখেছি। পড়তে পড়তে দেখলাম আনুমানিকভাবে এমন মত আরো অনেকেই পোষন করেছেন। "নিবেদিতার নিজেকে আলোর মতো ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টাতেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন এমন এক প্রেরণা শক্তি, যা তাঁকে পরবর্তীকালে অনেক রচনাতেই সাহায্য করেছে।" (নিতাই বসুর প্রবন্ধ। 'কোরক' পত্রিকা থেকে) (পৃ ১১৭ শারদ ১৪১৪)।

"গোরা ও নিবেদিতা" তিনি আরও এক জায়গায় লিখেছেন, - "রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসটি'র গুরুত্ব ও মহত্ব নানাদিক থেকে বিবেচনার যোগ্য। 'গোরা' চরিত্রে ব্রহ্মাবান্ধব, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা কিম্বা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কতখানি মিশে আছেন, তা স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত গবেষণার বিষয়, কিন্তু নিবেদিতাই যে 'গোরা' সৃষ্টির মুখ্য প্রেরণা এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।" (তদেব পৃ ১১৭)

দেখলাম এই একই ব্যাপারে বহুকাল আগেই চিন্তামিল দেখিয়েছেন, রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২য় খণ্ডের পত্র নিচয়ের ছত্রেছত্রে।

"স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তা সমন্বিত হইয়াছিল; ... তাঁহার আদর্শায়িত হিন্দু সমাজের সাধ্য ছিল না যে আইরিশ মহিলা মিস মার্গারেট নোব্‌লকে 'ভগিনী নিবেদিতা' আখ্যা দিয়া হিন্দু সমাজের কোনো পর্যায়ে কণামাত্র স্থান করিয়া দিতে পারে। সনাতন ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার বর্জন করিয়া কোনো ব্রাহ্মণের পক্ষে সন্ন্যাসিনী নিবেদিতার সহিত পঙ্‌ক্তিভোজন করা সম্ভব ছিল না। গোরার চরিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ও নিবেদিতার মিশ্রিত স্বভাবকে পাই বলিলে আশা করি কেহ আঘাত পাইবেন না। নিবেদিতার পক্ষে হিন্দু হওয়ার অসম্ভবত্ব কল্পনা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ যেন আইরিশম্যানের পুত্র গোরাকে উপন্যাসের নায়করূপে সৃষ্টি করিলেন। মিস নোব্‌ল ও জাতিতে আইরিশ। একবার শিলাইদহে নিবেদিতা কবির অতিথিরূপে আসেন। একদিন একটা গল্প মুখে মুখে কবি বলেন, সেটা খানিকটা 'গোরা'র মতো। সুচরিতা গোরাকে তার বিদেশী জন্মের জন্য প্রত্যাখ্যান করে এই কথা শুনিয়া নিবেদিতা খুব ক্রুদ্ধ হন, রবীন্দ্রনাথ গোরার ইংরেজি অনুবাদক মিঃ উইলিয়াম উইনস্ট্যানলি পিয়ারসনকে একপত্রে (১৯২২) এই তথ্যটি লেখেন।" (পৃ২৮৩/২৮৪)

আর একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মহা. সংঘটন এবং সংগঠনের সমমর্মী সহায়তার জন্য নিবেদিতার কাছে বিশ্বকবি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞতাভাজন ছিলেন।

বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী এবং প্রথম জাপানি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ কাকুজো ওকাকুরা প্রসঙ্গে একটুখানি চকিত স্পর্শ এখানে আনতেই হবে - নচেৎ রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতার সংযোগ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সবিস্তার লেখার স্থান সংস্থান এখানে হবে না। সেটাই হবে আর একটি পর্যায়ের প্রবন্ধের কনটেন্ট - যার নাম হতে পারে "নিবেদিতা ওকাকুরা এবং রবীন্দ্রনাথ।"

ভারতবর্ষ ও জাপান তথা দূর প্রাচ্যের যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন নির্মিতি পেয়েছিল এবং সেই থেকে যে আন্তঃ এশীয় বন্ধুতার স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল, তার ভিত্তি গড়ে তোলার স্থপতিদের মধ্যে নাম অবশ্যই করতে হবে নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের। এবং আর একটি স্তম্ভ হলেন সেই ওকাকুরা। - যাঁরা নামে কলকাতার সল্টলেকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সদ্য উন্মোচিত ভবনটির নাম হয়েছে ওকাকুরার স্মৃতিতে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রান্তিকে সদ্য জাগ্রত জাপান-এর তরুণ আদর্শবাদী শিল্প শাস্ত্রী ওকাকুরা তখন থেকে ASIA IS ONE - এর স্বপ্ন দর্শন করছিলেন।

"বিংশ শতকের শুরুতেই চীন জাপান ও দূর প্রাচ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কৌতুহলী মন আকৃষ্ট হইয়াছিল - ইহার জন্য দায়ী বোধ হয় ওকাকুরা যিনি ১৯০২ সালের আরম্ভে কলিকাতায় আসেন। ... রবীন্দ্রনাথ বিলাতপ্রবাসী জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী অবলাদেবীকে লিখিয়াছিলেন -'যদি আপনারা ভারতবর্ষে ফিরিবার সময় জাপান দিয়া ঘুরিয়া আসেন তবে সেই সময়ে জাপানে গিয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার একান্ত চেষ্টা করিব। নিবেদিতার কল্যাণে একটি জাপানির সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছে। এই জাপানি বন্ধু ওকাকুরা।' ...

"জাপান ও ভারতের চিত্তের যোগ বন্ধনের আশায় তিনি আসেন স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্য। তাঁহার ইচ্ছা - ভারতের এই ত্যাগমূর্তি নরোত্তম সন্ন্যাসী যেন জাপানের নবচেতনা স্বচক্ষে দেখিয়া আসেন। স্বামীজি তখন ভগ্নস্বাস্থ্য-জাপানে তাঁহার যাওয়া হইল না। স্বামিজীর দেহান্তের (২ জুলাই ১৯০২) চৌদ্দ বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথই ভারতের প্রথম দূত রূপে জাপানে যান ১৯১৬ সালের মে মাসের শেষে।" (তদেব পৃ ৫৬০) রবীন্দ্র জীবনী

কাজে কাজেই এই মহান সাংস্কৃতিক দৌত্যকর্মের অবদান কল্যাণীর নাম অবশ্যই নিবেদিতা।

'বলা বাহুল্য, এই সব প্রেরণার মূল উৎস ছিলেন ওকাকুরা,

ব্যাপ্তিকারে নিবেদিতা। ওকাকুরা লিখিত I deals of the East - এর ভূমিকা লেখেন নিবেদিতা (১৯০৩)।" (তদেব - বৃঃ ৫৬১)

সেটা ১৯০২/০৩ এর সময়কালের ঘটনা। আরো জানা যায় "দুই একজন ভাবুক জাপানী আসিতেছেন। মুষ্টিমেয় বাঙালি মনীষীদের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হইতেছে। এই আশাবাদী আদর্শ সন্ধানীদের অন্যতম হইতেছেন কাকুজো ওকাকুরা;... বাংলাদেশে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় একদিকে রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধুদের সহিত, ভগিনী নিবেদিতার সহিত ও অপর দিকে ঠাকুরাড়ির

সহিত। (তদেব পৃ ১৪২) (রবীন্দ্রজীবনী)।

এবারে রবীন্দ্রনাথের 'লোকমাতা'-এই ললাম.ভূষণ প্রদান প্রসঙ্গে লিখি-রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতা সম্বন্ধে পরম মূল্যায়ণ করেছেন তাঁর অনবদ্য লিখন শৈলী দিয়ে 'পরিচয়' গ্রন্থে। (জন্মশত বার্ষিকী রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড)।

"অন্য যুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহার নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাহারা নিজেকে সকলের উপর রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন - "তাহারা শ্রদ্ধাপূর্বক অপরকে দান করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে। ... কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন। তিনি তাহার বিন্দুমাত্র হাতে রাখেন নাই। ... জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড়ো সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। ... মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালোবাসিতেন। তাহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই 'পীপল'কে, এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপন কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।" (তদেব/ রচনাবলী/১৩ খণ্ড পৃঃ- ১৯৫/'পরিচয়')।

– "বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে, তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই।" (তদেব পৃঃ ১৯৬)

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে নিবেদিতার জীবনাবসানের পর শোকাভিভূত রবীন্দ্রনাথ কেন তাঁকে লোকমাতা আখ্যা দিয়েছিলেন। যারা এই প্রসঙ্গে আরো সবিস্তার জানতে চান তাঁদের তথ্য.হংস হওয়ার উৎস।

(১) শতরূপে সারদা-গোলপার্ক কলকাতা (২) নিবেদিতা লোকমাতা-শঙ্করী প্রসাদ বসু। (৩) পত্রাবলী - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ষষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ২০৬ (৪) রবীন্দ্র জীবনী (২য় খণ্ড) প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (৫) রবীন্দ্ররচনাবলী - পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ ত্রয়োদশ খণ্ডে - 'ভগিনী নিবেদিতা' (১৩১৮) 'পরিচয়' - প্রবন্ধাবলী। এই প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ লোকমাতা STUDIES FROM AN EASTERN HOME (1913) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এখানে খুব সহজেই অনুমান করতে পারা যায় যে, নিবেদিতা তাঁর প্রাচ্যদেশের নিবাসন (HOME)- এ এসে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কতোটা সংবেদীভাবে মনোযোগী ছিলেন।(৫) 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা - শারদ ১৪১৪-এ নিতাই বসু-র প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতা'। ❑